Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 181-188
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্র পরিক্রমায় রবীন্দ্র স্মরণ

ড. সুবিকাশ জানা
অধ্যক্ষ, দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In Literature, Rabindranath is phenomenon and his creative waves have eternal and aesthetic appeal in the sands of time. Childhood wonder, adolescent flippancy and playfulness, the dream world and heyday of youth and the simultaneous disillusionment caused by 'Life's little ironies' have promoted creator Rabindranath to such a height that Rabindranath as a man is overshadowed. Whatever life has offered him has been thoroughly imbibed and transmitted in his expressions. He has seen into the 'life of things', felt the power of Almighty (Jiban Debata) and realized in 'sublime mood' the presence of the Ideal and searched God in man. Not only the passion of creation but its ecstasy and the desire to bathe in it have been channelized into his writings. Growing age and maturity reflect kaleidoscopic stances of Rabindranath: conventional, materialist, aesthetic, spiritual, transcendental and humanist. Even after visualizing the devastating horrors of World Wars, he has never lost faith in mankind, but gave the clarion call to new possibilities. He always was against injustice and for the benefit of farmer class he initiated the formation of co-operative societies and also served them with homeopathy treatment by assimilating the essence of 'Vaktijog', 'Karmajog' and 'Gyanjog'. Transnational Rabindranath was also recognized worldwide with the Nobel Prize in Literature, and became known as Viswakabi or World Poet. Hence, reassessing Rabindranath is only possible through an introspective re-reading of Rabindranath.

Keywords: Humanism, Jiban Debata, Aestheticism, Kaleidoscopic, Transnationalism.

বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জল জোতিষ্ক রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ক্ষেত্র যেন প্রস্তুত ছিল। একদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একই সঙ্গে নিয়ে এলেন নাটক, কাব্য, সনেট ইত্যাদির ধারা, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী আনলেন সর্ব প্রথম স্বার্থক গীতিকাব্য যাঁর অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ জোয়ার এনে ছিলেন, আর অন্য দিকে প্রস্তুত ছিল রোমান্টিক ভাবনা যুক্ত ধর্মীয় আবরণে মোড়া বৈষ্ণব পদাবলীর। অর্থাৎ সূর্য উদয়ের পূর্বে যেমনি উষা আসে তেমনি উষার প্রারম্ভে রয়েছে শেষ প্রহর। আমরা বলি রাত্রির শেষে শুকতারার উদয়। শুকতারা ও উষারাণী রূপ জোত্যিষ্ক মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবতীর্ণ হয়ে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্র প্রস্তুত রেখেছিলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে নিজেকে অঙ্কুরিত করতে লাগলেন। সমসাময়িক রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের মত পাশ্চত্ত্য শিক্ষা দীক্ষার স্পর্শে ধন্য লেখক কুলের সাহিত্য ক্ষেত্রে আগমণ ঘটেছে, আর ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ আবির্ভুত হলেন। সমাজও যেন রবীন্দ্রনাথের আসার ক্ষেত্র প্রস্তুত রেখেছিলেন। সতীদাহ প্রথা রোধ, বহু বিবাহ প্রথা

রোধ, বাল্য বিবাহ প্রথা রোধ, নারী শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে তৎকালীন সমাজ এক বিশেষ সুস্থির অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। বিশৃঙ্খল সামাজিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে যেন থিতিয়ে আসছে। এই রকম একটি সময়ে মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অষ্টমপুত্র রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই মে জন্মগ্রহণ করলেন।

ছাই চাপা আগুনকে কখনো লুকিয়ে রাখা যায় না। তার প্রকাশ পাবেই। 'বাড়ন্ত গাছের পওরে মালুম' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে মহিরুহ রূপে ধরা দেবেন দেখা দেবেন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন তার পূর্বাভাষ আমরা পাই মাত্র কবির ১২ বছর বয়সের রচনা থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল ডিগ্রী) বিদ্যায় পারদর্শী না হলেও তিনি পাঠ নিয়ে ছিলেন বাড়িতে অর্থাৎ তাঁর বিদ্যালয়ের, মহাবিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী ডিগ্রী না থাকলেও বাড়িতে বসেই তিনি নানা ভাষায় নানা বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। স্বদেশে বিদেশে বেশ কিছু কাল পড়াশোনা করলেও আমরা যে অর্থে স্কুল বা কলেজের পড়া বুঝি, সে অর্থে তিনি প্রায় মূর্খ। কিন্তু অসাধারণ পাণ্ডিত্য পেয়েছিলেন পরিবারের মধ্যে থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সঙ্গীত ইত্যাদি নানা-বিধ বিষয়ে তিনি চর্চা করেছিলেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন 'ভূভার হরণের জন্য তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হন' ঠিক তেমনি করে বাংলা সাহিত্যের দৈন্য দশা ঘুঁচাবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং দাবী করে ছিলেন শতবর্ষ পরেও তার কবিতা অনেকেই পড়বে। তাঁর এই দাবী তাঁর ঔদ্ধত্বের প্রকাশ নয় তাঁর দাবী যে চিরন্তন সত্য শার্ধ শতবর্ষ পরেও এসে আমরা তার প্রমাণ পাই। ১২ বছর বয়স থেকে লেখা তিনি শুরু করেছিলেন প্রায় ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত সেই লেখাতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অর্থাৎ সম্ভবত 'অভিলাষ' দিয়ে শুরু করে 'শেষ লেখা' দিয়ে তাঁর লেখা সমাপ্ত। লেখনি, অজস্র শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী এত বিস্তৃত কিছুটা ভ্রান্তিকরও বটে, তা স্বল্প পরিসরে সম্যক পরিচয় প্রদান করা দুঃসাধ্য ব্যপার, তথাপি তার রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করে আমি চেষ্টা করব তাঁর রচনা আজও জনপ্রিয় কেন? অথবা আদৌ জনপ্রিয় হয়েছিল কিনা। যেই বিষয়টিও পর্যালোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করব।

বিভিন্ন বিতর্ক বিভিন্ন মতভেদ থাকা সত্বেও আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনা সমগ্রকে কতগুলো পর্যায়ে ভাগ করতে পারি-

১) প্রস্তুতি পর্ব ও উন্মেষ পর্ব
২) ঐশ্বর্য পর্ব
৩) ভারত দর্শন ও অধ্যাত্ম পর্ব
৪) বলাকা পর্ব
৫) পুনশ্চ পর্ব
৬) অন্ত্য পর্ব

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্য আমরা উপরিউক্ত নানা পর্বের রচনাগুলির মধ্যে পাব। প্রত্যেকটি রচনার প্রেক্ষাপট বা পটভূমি এমন ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ যেন বাধ্য ছিলেন এ প্রেক্ষাপটে বিশেষ ধরণের রচনা করতে। পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন যেন বাধ্য করিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে এই বিশেষ ধরণের রচনা করতে। শৈশবের সেই দিনগুলো যখন প্রকৃতির সব কিছুই অব্যক্ত ভালো লাগার মত তাঁর কাছে ধরা দিতো নিস্পাপ সরল শিশু ১২-১৪ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথ তখন লিখেছিলেন কবিতা 'অভিলাষ', লিখেছেন 'ভারতভূমি', লিখেছিলেন 'হিন্দুমেলা' ইত্যাদি। তাঁর সর্ব প্রথম রচনা কোনটি এ নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। আমি তাঁর বালক বয়সের বিভিন্ন রচনা কে বালকোচিত বলে উড়িয়ে দিতে পারিনা। আমাদের বিস্ময়ে অবাক হতে হয় তিনি ঐ সময় রচনা করে চলেছেন 'পৃথ্বিরাজ পরাজয়', নামক বীর রসাত্মক গাথা কাব্য। এতে প্রচলিত পয়ার প্রভৃতি ছন্দ তিনি ব্যবহার করেছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন অমিত্রাক্ষর ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করতে। শুধু স্বদেশে নয় বিদেশে থাকাকালীনও তিনি নানা গ্রন্থ রচনা করেছেন।

প্রতিটি মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে। জীবন কখনো সুনির্দিষ্ট সরল রেখায় সবর্দা চলেনা। ২০ বছর বয়সে যে কাব্যটি পাঠককে উপহার দিলেন বিদেশে থাকাকালীন, তা থেকে বোঝা যায় তার জীবনে হয়ত এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেছে যার বর্ণনা 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮২) কাব্যে আমরা পাই। 'শৈশব সংগীত' এ রচনাগুলি উপেক্ষা করেছিলেন অত্যন্ত অপরিণত রচনা বলে। কিন্তু এই অপরিণত রচনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে এগোতে হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ের এই অপরিণত রচনাই পরবর্তী

কালে পরিণত রচনা করতে সাহায্য করেছিলেন। আর এরই হাত ধরে তিনি নিজেকে বিকশিত করেছিলেন। আর রচনা করেছিলেন 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী', 'কড়ি ও কোমল' প্রভৃতি। 'প্রভাত সঙ্গীত' কাব্যে কবির একটা পরিণতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। যেখানে তিনি সীমার বন্ধন থেকে অসীমের পথে আহ্বান জানিয়েছেন-

'আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের' পর।
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান,
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ'। (রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, নির্ঝারের স্বপ্ন ভঙ্গ, ভাদ্র-১৪২২, পৃ.-৫০)

রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পরিণতির একটা সুস্পষ্ট পূর্ব্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রকৃতিকে এমন ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যার ফলশ্রুতি 'প্রভাত উৎসব' রচনায় পরিলক্ষিত হয়। যেখানে তিনি বলেছিলেন-
'জগৎ আসে প্রাণে জগতে যায় প্রাণ
জগতে প্রাণ মিলে গাহিছে একি গান,'

সাগর লহরী যেমন সাগরে উত্থিত হয়ে সাগরে মিলিয়ে যায়, তেমনি জগৎ আসে প্রাণে জগতে প্রাণ মিশে যায়। পারস্পরিক এই মেল বন্ধন রবীন্দ্র কাব্যে চমৎকার ভাবে পরিদৃশ্যমান হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কাব্য থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেননি। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে ও তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি লিখেছিলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। এই কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে একটা কথা স্বীকার করে নেওয়া আবশ্যক যে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না। বৈষ্ণবীয় গূঢ় কথা তাঁর জানা সম্ভব ছিল না। বয়স কম থাকার কারণে হয়ত তিনি পদাবলীর জটিল তত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। তবে ১৭ বছর বয়সে বৈষ্ণব পদাবলীকে হয়ত তিনি নিছক প্রেম কাব্য হিসাবেই দেখেছিলেন। তাই তাঁর রচনার রাধা যেন রক্তমাংসের এক নায়িকা। বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি স্বরুপা প্রেমিক শিরোমণি রাধিকা নন, তিনি যেন এক রক্তমাংসের নায়িকা তথাপি একে বারে যে বৈষ্ণবীয় ভাব ছিল না তা নয় যখন তিনি বলেন-
বার বার সখী বারণ করুন,

ন যাও মথুরাধাম।
বিসরি প্রেমদুখ রাজভোগ যথি
করত হমারই শ্যাম।
ধিক তুঁহুঁ দাম্ভিক ধিক রসনা ধিক,
লইলি কাহারই নাম?
ভানু কহতঅয়ি বিরহকাতরা
মনসম বাঁধহ থেহ।
মুগুধা বালা, বুঝই বুঝলি না,
হুমার শ্যামক লেহ। (রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ভাদ্র-১৪২২)

ধীরে ধীরে নিজেকে পুষ্ট করেছেন কবি, পারিপার্শ্বিকতা তখনো তার ওপরে প্রভাব ফেলে চলেছে। প্রকৃতির হাতছানি থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। তাই তাঁর 'ছবি ও গান' কাব্যে যেমন পোড়া বাড়ির প্রসঙ্গ এসেছে, তেমনি এসেছে শকুন,বাদুড় প্রভৃতির প্রসঙ্গ। 'কড়ি ও কোমল' এই পর্যায়ে এমন একটি কাব্য যেখানে মানব হৃদয়ের চিরন্তন বাসনা কি? সেকথা তিনি প্রথম ব্যক্ত করলেন স্পষ্ট ভাবে। বস্তুত পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের রচনার মধ্যে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল তা হল মানব হৃদয় এবং মানব চরিত্র। অসম্ভব এই জটিল বিষয়কে তিনি প্রায় সারাটা জীবন জানার চেষ্টা করেছেন। যেমন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের জীবন মশায় সারাটা জীবন পিঙ্গলকেশীর স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিল। ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথও মানবহৃদয়কে মানব চরিত্রকে চিত্র ও সঙ্গীতের সাহায্যে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। আর এই কাজ তিনি শুরু করেছিলেন বহু পুর্বে 'কড়ি ও কোমল' কাব্য থেকে যেখানে তিনি বলেছিলেন-

'নিশীথে রয়েছি জেগে; দেখি আমি মেঘে,

লক্ষ্য হৃদয়ে সাধ শূণ্যে উড়ে যায়।
কত দিক হতে তারা ধায় কত দিকে।
কত না অদৃশ্যকায়া ছায়া আলিঙ্গন
বিশ্বময় তারে চাহে, করে হায় হায়।
কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শশ্মানশয়ন
অন্ধকারে হেরো শত তৃষিত নয়ন
ছায়াময় পাখি হয়ে কার পানে ধায়।
ক্ষীণশ্বাস মুমূর্ষুর অতৃপ্ত বাসনা।
ধরণীর কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়ায়।
উদ্দেশে ঝরিছে কত অশ্রুবারিকণা
চরণ খুঁজিয়া তারা মরিবারে চায়।
কে শুনিছে শত কোটি হৃদয়ের ডাক।
নিশীথিনী স্তব্ধ হয়ে রয়েছে অবাক। (রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, মানব হৃদয়ের বাসনা, ভাদ্র-১৪২২, পৃ.-২০৭)

এই হৃদয়ের ডাক হৃদয়ের পরিচয় রবীন্দ্র রচনায় আমরা প্রায়সই শুনতে পাই তার প্রথম ফলশ্রুতি 'মানসী'। রবীন্দ্রনাথ রক্ত মাংসে গড়া এক যুবক। যুবক বয়সে তাঁর মনের মধ্যে যে রোমান্টিক কল্পনাগুলো ছিল সেই কল্পনাগুলোকে নানা কবিতায় তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন এই 'মানসী' কাব্যটি পূর্ববতী 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' 'প্রভাত সঙ্গীত' 'ছবি ও গান' 'ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী' 'কড়ি কোমল' প্রভৃতি রচনা থেকে ভিন্ন।

মানসীতে তিনি তার শিল্পী সত্ত্বার আগমণ ঘটালেন অর্থাৎ ছন্দ নিয়ে তিনি যে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন তার পূর্বাভাস এই কাব্যে দেখা যায়। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়-

'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসীপ্রতিমা,' (রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, উপহার, ভাদ্র-১৪২২, পৃ.২২৯)

কিন্তু এই মানসী প্রতিমা কবির একান্ত সুখছ্বাস মূর্তিমতি মনের কামনা। এক অনবদ্য সৃষ্টি এই 'মানসী' কাব্য। এখানে কে যেন রবীন্দ্রনাথের নবসৃষ্টির আহ্বানে সাড়া দিতে থাকে কিন্তু কে সে? যন্ত্র রবীন্দ্রনাথ ও যন্ত্রী রবীন্দ্রানাথ এই দুই সত্ত্বার মধ্যে এক মেল বন্ধনের ডোর যেন কে তৈরী করে রেখেছে। শুধু গেঁথে দেওয়ার পালা। রবীন্দ্রনাথের মানসী যেন বাক্ দেবী সরস্বতী কিংবা জীবন দেবতা। যিনি একদিকে যেমন সূতো তৈরী করে রেখেছেন তেমনি স্রষ্ঠা রবীন্দ্রনাথকে অযুত সৃষ্টি করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু অপরিপক্ক রবীন্দ্রনাথের মনে ব্যক্তিগত জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেছে ফলে তিনি যেন অনেকটাই দিশে হারা। তাই প্রশ্ন করেন এবং ভাবেন-

'বসন্ত নাই এ ধরায় আর
আগের মতো,
জ্যোৎস্না যামিনী যৌবনহারা
জীবনহত'। (রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ভুল-ভাঙা, ভাদ্র-১৪২২, পৃ.-২৩২)

কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা বেশিদিন তাকে ধরে রাখতে পারেনি। তিনি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে অনেকটাই সচেতন হলেন। নিজের প্রতিভা, নিজের আত্মসম্মান বোধ সবকিছুই একটা জায়গাতে তাঁকে নিয়ে গেল, তাই 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে তিনি ঘোষণা করলেন এক অমৃত বাণী-

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। (রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ভাদ্র-১৪২২, পৃ.-১৬১)

বস্তুতপক্ষে তিনি যেন বাঁচার এক রসদ আবিষ্কার করলেন। শুধু তাই নয় কবিতার ক্ষেত্রেও বিচিত্র সৃষ্টি করলেন। কাদম্বরীর মৃত্যু সাময়িকভাবে রবীন্দ্রনাথকে বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু স্থায়ীভাবে এই মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছিল যে সেখানে কবিচিত্তের একটা নিলিপ্ততার ভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তাই বৌদির

মৃত্যুর পর 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বিশেষত সনেট গুলিতে দেহাতীত প্রেম সৌন্দর্য্য সম্ভোগের কথা অনায়াসেই তিনি বলতে পেরেছেন। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে যা শুরু করেছেন, 'মানসী'তে এসে যেন অনেকটাই এগিয়ে গেলেন সাধনার পর্যায়ে। রচনা করলেন একে একে উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী'। শুন্য হৃদয়ের আকাঙ্খা সংশয়ের আবেগ 'নিস্ফল প্রয়াস' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর দ্বিধামুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। একটা অতৃপ্তি, একটা উৎকন্ঠা সবই যেন পাশাপাশি আসতে থাকে। সীমার বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বিশ্বআত্মার সঙ্গে তিনি মিলিত হতে চাইছেন। সেই সঙ্গে কায়ার দিক দিয়ে ছন্দ সম্পর্কে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন।

ঐশ্বর্য্য পর্বেই শুধু নয় রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ট সম্পদ 'সোনার তরী'। এই কাব্যে তিনি এমন দুটো বিষয়ের অবতারণা করলেন যেটা সমগ্র জীবন ধরে যত রচনা তিনি করেছেন প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে সেই বিষয়গুলোকে বিচিত্র রঙে, বিচিত্র রসে, বিচিত্র ঢঙে উপস্থাপিত করেছেন। সেই বিষয় দুটি হল মানস সুন্দরী এবং জীবন দেবতাবাদের সূচনা। তিনি নেমে এলেন মাটির পৃথিবীতে বাস্তব জগতে। জমিদারি দেখাশুনার ভার তার উপরে পড়ল এর ফলে বাংলা দেশের গ্রাম্য জীবন যাত্রার সুখ দুঃখের সঙ্গে তিনি নিজে জড়িয়ে গেলেন। ব্যক্তিত্বের বন্ধন যেটা সুদৃঢ় ছিল অনেকটা আলগা হয়ে গেল। তিনি বাস্তব সত্যের ওপর নিজের রচনাকে প্রতিষ্টিত করার চেষ্টা করলেন। জীবন দেবতা, মানস সুন্দরী ভাবনাগুলো এই বাস্তব সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের ফসল, তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন জীবন দেবতার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে-
'আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনশক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ দঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্য দান তাৎপর্য্য করিতেছে। আমার রূপ রূপান্তর জন্ম জন্মান্তরকে একসুত্রে গাঁথিতেছে যাহার মধ্যে দিয়ে বিশ্ব চরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছে তাহাকেই জীবন দেবতা নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম...'

স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতে গ্রামীণ মানুষ গ্রাম্যজীবনের ছায়া 'সোনার তরী' কাব্যে সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়। আর এই পর্যায়ে বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ট কাব্য 'চিত্রা' রচিত হয়। এই 'চিত্রা' কাব্যে কবির ব্যক্তি সত্ত্বা বিশ্ব সত্ত্বার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাইছে। লীলা সঙ্গিনী মানস সুন্দরী অন্তরযামী জীবন দেবতাকে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে দেখতে চেয়েছেন। অনুভব করতে চেয়েছেন তাই 'চিত্রা' কাব্যে তিনি বলে ওঠেন-

'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিনী',

প্রশ্ন করেছিলেন একান্ত মনে এই বিচিত্র রূপিনী সে কি অন্তর বাসিনী? একদিকে রয়েছে শ্বাশত প্রেমের কথা, অন্যদিকে রয়েছে ভারত চেতনার উন্মেষ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে অধ্যাত্মের পথ ধরে পা বাড়িয়েছেন। নারী প্রেমের ব্যর্থতায় যেমন তিনি লিখেছিলেন 'ভগ্ন হৃদয়', তেমনি কালের বিবর্তনের পারি পার্শ্বিক প্রতিবেশে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন চিরন্তন প্রশান্ত দায়িনী লীলা সঙ্গিনীর কথা, জীবন দেবতার কথা, মানস সুন্দরীর কথা। ধীরে ধীরে শূণ্য আকাশ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি নেমে এলেন মর্ত্য পৃথিবীতে। শুরু করলেন পরাধীন ভারতবর্ষের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন ভারতের লুপ্ত গরিমার কথা প্রচার করতে প্রাচীন ভারতে সেই উজ্জয়িনী, সেই বিদিশা সেই বেত্রবতী সেই তপোবন সেই বাল্মিকীর যুগ সবকিছু যেন কবি মনকে উদ্বুদ্ধ করেছ। প্রায় দশ বৎসর ধরে তিনি ভারত দর্শনের কথা বিভিন্ন ভাবে তাঁর কাব্যে চিত্রিত করেছেন। 'কথা কাহিনী', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য', 'স্মরণ', 'শিশু', 'উৎসর্গ', 'খেয়া' প্রভৃতি কাব্যে তিনি ভারতীয় লুপ্ত গরিমাকে নানা ভাবে উপস্থাপন করছেন।

সংসারে নারী প্রেমে যেটুকু আকর্ষণ ছিল এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনে তা কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যায় অর্থাৎ এই সময় তিনি তাঁর পত্নীকে হারিয়ে ফেলেছেন। একের পর এক বেদনা রবীন্দ্রনাথকে গ্রাস করল। বন্যা যেমন ধ্বংস করে দেয় অনেক কিছুকে, তার মধ্যে এমন অনেক ধ্বংস থাকে যা আর কোনদিন ফিরে আসে না। এই সময় রবীন্দ্রনাথের জীবনে বেদনার ধ্বংসাত্মক বন্যা রবীন্দ্রনাথের জীবনকে তোলপাড় করে তুলেছিল পত্নীর মৃত্যু, সন্তানের মৃত্যু, জমিদারী পরহস্তগত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের বিপর্যয় তার জীবনে আসে। কিন্তু ধ্বংসের মধ্যে থাকে একটা সৃষ্টির আভাস। বন্যা যেমন দুকুল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়, ঠিক তেমনি কিছু পলি দিয়ে যায়, আর সেই পলিতে সোনার ফসল ফলিয়ে মানুষ নিজেকে কিছুটা হলেও বাঁচার রসদ পায়। জীবনের বিশেষ এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবনের নানা ছবি নানা দৃশ্য টুকরো টুকরো করে তাঁর মনে পড়তে লাগল, আর বাংলা কাব্যের আসরে বাংলা কাব্যের প্রবাহে তিনি সংযোজনা করলেন কাহিনী যুক্ত ছোট্ট ছোট্ট

কবিতা, যাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন 'কথা কাহিনী', 'ক্ষণিকা' ইত্যাদি। এ যেন ছোট গল্প। কবি নিজেকে আরও নিয়ে গেলেন এমন একটি স্থানে যেখানে মনুষ্যত্বের মুক্তির আহ্বান শোনা গেল। কিন্তু পাশাপাশি স্মরণ করলেন অতীতকে। সেখানে ব্যক্তিগত বেদনার মধ্যে কবিতাগুলো সীমাবদ্ধ থাকেনি তা হয়ে উঠেছে সার্বজনীন। 'শিশু' কাব্যের মধ্যে দেখা যায় কবির কল্পনা ও কবির মেয়লীপনা প্রাধান্য পেয়েছে।

এই পর্বে তিনি এমন একটি কাব্য উপহার দিলেন যা বিশেষ ঈঙ্গিত বহ, তার নামটি হচ্ছে 'খেয়া"। খেয়া অর্থাৎ নৌকা। এই নৌকা দিয়ে কবি যেন অধাত্ম্য জীবনে পাড়ি দিতে চেয়েছেন। একদিকে রূপের জগৎ ও অন্যদিকে অরুপের জগৎ এই দুই জগতের মাঝে পড়ে থাকল যে ব্যবধান সেই ব্যবধান পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রয়োজন খেয়া। নৌকা যেমন একঘাট থেকে অন্যঘাটে পাড়ি দেয় তেমনি কবিও প্রেম সৌন্দর্যের জগৎ ছেড়ে ভক্তি ও অধ্যাত্ম সাধনার পথে যাত্রা করতে চাইলেন। আর খেয়াতে চেপেই যেন তিনি চলে যেতে চাইলেন। যার ফলে তিনি রচনা করলেন যুগান্তকারী রচনা 'গীতাঞ্জলী'।

এই পর্বে রচনা করলেন আরও দুটি কাব্য 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'। এখানে ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধির কথা চিত্রিত হয়েছে। 'গীতাঞ্জলী' কাব্যের কবিতাগুলো রচনার পুর্বে কবির ব্যক্তি জীবনে যেমন শোকের কারন ঘটেছিল, তেমনি পারিপার্শিক পরিবেশেও এই ধরনের কাব্য রচনার অনুকুল ছিল। একটি ধর্মীয় চেতনা তাঁর মধ্যে বরাবরই ছিল। এই গীতাঞ্জলী পর্বে এসে তিনি নিজেকে অধ্যাত্ম চেতনায় নিমগ্ন রেখেছিলেন আর একের পর এক কাব্য রচনা করলেন। 'গীতাঞ্জলী', 'গীতিমাল্য', 'গীতালী' এই সমস্ত কাব্যে কবি ঈশ্বরের সঙ্গে মানব সম্পর্কের কথা বিবৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ চিরচঞ্চল, তাঁর প্রতিভা নিত্য পরিবর্তনশীল। অধ্যাত্ম পর্বে তিনি ঈশ্বরের অনুভূতির কথা বলেছেন ঠিকই কিন্তু পর মুহুর্তেই ফিরে এসেছেন জীবনের কথা নিয়ে। 'বলাকা' থেকেই তিনি নতুন কথা শুরু করলেন অর্থাৎ অনুভব করলেন 'থেমে থাকাটাই মৃত্যু চলাই জীবন' ইত্যবসরে তিনি পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করে এসেছেন এবং উপবদ্ধি করেছেন-

'পড়ে থাকা পিঁছে মরে থাকা মিছে'

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি কবিকে অন্য দিকে নিয়ে গেছে। এখানে উল্লেখ করা, আবশ্যক যে পাশ্চাত্য ফরাসী দার্শনিক বার্গ সঁ যে ক্রমবিকাশশীল গতির কথা প্রচার করেছিলেন, তার দ্বারা উদবুদ্ধ হয়ে তিনি এই গতিবাদের কাব্য রচনা করেছিলেন। যদিও বার্গ সঁ এর গতিবাদ এবং রবীন্দ্রনাথের গতিবাদের পার্থক্য রয়েছে তথাপি পাশ্চাত্য প্রভাবটিকেও আমরা একে বারে এড়িয়ে যেতে পারি না। সেই সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন সর্বপ্রথম বাংলা ছন্দে বৈচিত্র এনেছিলেন প্রচলিত প্রথাগত অন্তর্মিল বর্জন করে এর ছেদ যতির বিলোপ ঘটিয়ে, রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে ছন্দের এই বন্ধনটুকু রাখলেন না তিনি ছন্দকে মুক্তি দিলেন অর্থাৎ এই পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথ মুক্তক ছন্দের পর্বতন করলেন।

'বলাকা', 'পলাতকা' এই পর্বের কাব্যগুলি এই মুক্তক ছন্দে রচিত। শুধু কাব্য জগতে নয় এই পর্বে তিনি নাটক উপন্যাস গল্প ইত্যাদি রচনাতেও পিছিয়ে থাকেননি। তিনি কাব্যের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি এনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা হচ্ছে গদ্য ছন্দ। ভেবেছিলেন সত্তর বছর বয়স হয়েছে, এবার সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে পূজার্চনা নিয়ে থাকবেন। কিন্তু কবিচিত্ত তাঁকে স্থির থাকতে দিল না। তিনি এক সাবলীল সতেজ ভাব স্ফূর্তি নিয়েই 'পুনশ্চ' দিয়েই কাব্য কবিতা রচনা করলেন। অবশ্য কাব্য জীবনের সমাপ্তি আশঙ্কা তাঁকে গ্রাস করেছিল তা সত্ত্বেও তিনি রচনা করলেন 'চৈতালী', 'পুরবী', 'পরিশেষ' ইত্যাদি।

'গীতাঞ্জলী' কাব্যের গদ্যানুবাদ করতে গিয়ে তিনি বাংলায় গদ্য ছন্দের প্রবর্তন করলেন, আর রচনা করলেন 'সাধারণ মেয়ে' বাঁশী, 'ছেলেটা' ইত্যাদি, কবিতা যেখানে শুধু ছন্দ নয় মর্ত্য প্রীতির পরিচয় টাও রোমান্সের পরিবেশে বাস্তব সম্মত ভাবে চিত্রিত হয়েছে। সারাটা জীবন হাসি, অশ্রু বেদনায় একের পর এক কাব্য কবিতা রচনা করে গেছেন কিন্তু যখন 'প্রান্তিক' কাব্য রচনা করলেন তখন তিনি যেন নিজেকে মৃত্যু ভাবনায় এমন ভাবে ভাবিত করেছেন যাতে মনে হয় তিনি মৃত্যু স্নানেই জীবনকে শুচী শুভ্র, অনন্ত করে ফেলেছেন। ধীরে ধীরে জীবন সূর্য ঢলে পড়েছে এই সময় রচনা করলেন 'সেঁজুতি', 'নবজাতক' সানাই প্রভৃতি কাব্য। রোগসজ্জায় 'আরোগ্য', 'শেষলেখা' ইত্যাদি। প্রদীপ যেমন নেভার আগে দপ করে জ্বলে ওঠে তেমনি রবীন্দ্রনাথও অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে নিজেকে জাগিয়ে তুলেছেন, আর শারিরীক অক্ষমতা সত্ত্বেও নিজেকে নতুন করে যৌবন রাগে রাঙ্গিয়ে দিয়ে কিছু কিছু রচনায় নিজেকে লিপ্ত করেছেন।

এতো গেল কাব্যের কথা। সর্বভুক রবীন্দ্রনাথ নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি একের পর এক বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। 'কাল মৃগয়া', 'নলিনী', 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'বৈকুণ্ঠের মাতা', 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'শ্যামা' প্রভৃতি রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ মূলত গীতি কবি হলেও নাটকের ক্ষেত্রে তিনি এমন কিছু অবদান রেখে গেছেন যা তাঁর শার্ধশতবর্ষ পরেও সমভাবে সমাদৃত। যদিও তার নাটকে বস্তু নিষ্ঠতার অভাব অভিনয় যোগ্যতার অভাব, ভাষা সংলাপ কাব্যধর্মী, এত সব সত্ত্বেও নাটক কেবল মাত্র অভিনয়ের জন্য নয় পাঠ উপযোগী ও বটে, তা রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন। বিরুপ সমালোচনা সত্ত্বেও ক্ষুরধার লেখনি চালিয়েছেন। যেমন বলিদান প্রথা এ বিষয়টিকে তিনি একেবারেই মেনে নিয়ে পারেননি। 'বিসর্জন', নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখিয়েছন এটি একটি কুপ্রথা। জগৎ জননী কখনও সন্তানের রক্তপানের মধ্যে দিয়ে আর একটি সন্তানের সৃষ্টি করতে নারাজ। তাই জয়সিংহ, রঘুপতি, অপর্না, গুণবতী, গোবিন্দ, মাণিক্য প্রত্যেকটি চরিত্রই এই বোধের দ্বারা আবর্তিত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'বিসর্জন' নাটক রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১২৯৭ বঙ্গাব্দে আজ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ। এত বছর পরেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কেবল বাস্তব সত্য নয় প্রাসঙ্গিক ও চিরন্তন সত্য বটে।

কেবল ধর্মীয় আদর্শ নয় সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকেও যেখানে তিনি বিভেদ দেখিয়েছেন যেখানে তিনি সোচ্চার হয়েছেন। যান্ত্রিক সভ্যতা তিনি মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি বিশেষত যে ভারী যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের মনুষ্যত্ব বোধ বিবেক বোধ নস্যাৎ করে দেয়। ধ্বংস করে দেয় রুচি বোধকে, পাল্টে দেয় শুভ ভাবনাকে। সুরুচির বদলে কুরুচিকে আনে সেই ধরনের যান্ত্রিক সভ্যতাকে তিনি কোনোদিনও মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'রাজা ও রানী' প্রভৃতি নাটকে এ সমস্ত কথা নানা ভাবে পরিবেশন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির সম্পদ সকলের জন্য কেউ যদি মনে করে এই সম্পদ কেবল নিজেই কুক্ষিগত করবে তা হলে যে ভুল করবে। প্রকৃতি নিজের থেকেই তা সবার জন্য রাখে। এই সম্পদ সবার কাজে লাগবে। 'মুক্তধারা' নাটকে তাই দেখি প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ জলধারা উত্তরকূট ও শিব তরাইয়ের প্রজাদের নিমিত্ত আপন গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকটিকেও তিনি নানা ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

সাধারণ মানুষ রূপের পূজারী, কিন্তু রূপ যে কেবল মোহ সৃষ্টি করে নিজেকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখে নিজের বিচার বোধকে যে অনেকটা গ্রাস করে ফেলে, সেই বক্তব্য 'রাজা রানী', 'অরূপ রতন' প্রভৃতি নাটকে চিত্রিত হয়েছে। অর্থ পিপাসু রাজা কি করে নিজের হৃদয়কে বিসর্জন দিয়ে, কেবলমাত্র অর্থের মোহে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিল, পরে সেখানে থেকে নন্দিনীর কারনে মুক্তিলাভ করে তার কথা 'রক্ত করবী' নাটকে চমৎকার করে পরিবেশন করেছেন। হোক না এই জাতীয় নাটক গভীর তত্বপূর্ণ, বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথ নাটকের মধ্যে যে সকল বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন তা সবটাই আজও প্রাসঙ্গিক। বস্তুত ভারী শিল্প আজ অধিকাংশ মানুষকে বেকার করে তুলেছে। আর কতিপয় মানুষকে ধনী করেছে। কথায় বলে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। বাস্তবিক সারা পৃথিবীতে এমন অস্থিরতা চলছে, বিশেষত জঙ্গী হামলা তা থেকে প্রমাণিত হয় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কতখানি সুদূর প্রসারী ছিল। যন্ত্র না হলে মানুষের ক্ষুন্নি বৃত্তি হয় না ঠিকই কিন্তু যে সভ্যতা মানুষের অহমিকাকে বাড়িয়ে দেয়, সে যে কতখানি বীভৎস তা আজ আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ শুধু তাত্বিক ছিলেন না হাস্যরসিকও ছিলেন। তাঁর কিছু কিছু রচনা আমাদেরকে হাসায় যেগুলোকে আমরা ব্যঙ্গাত্মক বা হাস্য কৌতুক রচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। যেমন 'বিনি পয়সার ভোজ', 'নতুন অবতার', 'পেটে ও পিঠে', 'ছাত্রের পরীক্ষা' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কথা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ ও বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। উপন্যাস, গল্প, সর্বত্রই তাঁর অবাধ বিচরণ 'বৌ ঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষী', 'চোখের বালি", 'নৌকাডুবি', 'যোগাযোগ', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাস বিশেষ বিখ্যাত। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষী' উল্লেখযোগ্য। 'রাজর্ষী' উপন্যাসের নাট্যরূপ তিনি দিয়েছিলেন যার নাম 'বিসর্জন'। অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করেছিলেন। তবে উপন্যাসে লেখক অতিবাস্তবতার উর্ধে উঠতে পারেননি, একথা মনে হয় সত্য। তাইতো বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর বিয়ে হয়নি। বিধবা ননীবালার অকাল মৃত্যু হয়েছে।

উপন্যাসের ইতিহাসে মনস্তাত্বিকতার তুফান তুলে দিয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও তাঁর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'রজনী' উপনাসে এই রীতি প্রর্বতন করেছিলেন, তথাপি রবীন্দ্রনাথ সর্বাত্মক এবং সর্বব্যপক রূপে আভন্তরীণ বাস্তবতাকে বা মনস্তাত্বিকতাকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসে মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী, আশালতা, রাজলক্ষী, প্রত্যেকটি চরিত্রই মনস্তাত্বিকতার আবরনে গড়া। কেবল 'চোখের বালি' উপন্যাসে নয় 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে ও শচীশ ও শ্রীবিলাস দামিনী এবং জ্যাঠামশায় প্রত্যেকটি চরিত্রই আপন আপন বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন। বাস্তবিক দামিনী, বিনোদিনী এবং 'গোরা' উপন্যাসের সুচরিতা অনবদ্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে 'ঘরে বাইরে' উপনাস্যের বিমলাও কোন অংশে কম নয়। সন্দীপ, নিখিলেশ এবং বিমলা, বিহারী, মহেন্দ্র এবং বিনোদিনী ত্রিকোণ প্রেমের রহস্যপূর্ণ চিত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপনাস্যে অঙ্কিত করেছেন। বাংলা কথা সাহিত্যে মহাকাব্য ধর্মী উপন্যাসও রবীন্দ্রনাথের লেখনি থেকে বেরিয়েছিল। মহাকাব্য ধর্মী উপন্যাস 'গোরা' বিশ্ব কথা সাহিত্যের এক অপূর্ব সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের তুলনা কেবল রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

গ্রন্থঋণঃ

১। আয়ুব, আবু সইদ্. আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ. কোলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।
২। বন্দোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ. রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তা. কোলকাতাঃ কৃষ্টি, ২০১০।
৩। ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ. রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা. কোলকাতাঃ ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, ২০১২।
৪। ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ. রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা. কোলকাতাঃ ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, ২০১৩।
৫। বসু, শুদ্ধস্বত. রবীন্দ্রনাথের বলাকা. কোলকাতাঃ গ্রন্থ বিকাশ, ২০১৬।
৬। দাস, ক্ষুদিরাম. রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়. কোলকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০৯।
৭। দে, সত্যব্রত. রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা. কোলকাতাঃ প্রাগ্‌বিকাশ, ২০১০।
৮। ঘোষ, জগন্নাথ. রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্য সাংকেতিক মুক্তধারা. কোলকাতাঃ সাহিত্য নিকেতন, ২০১৩।
৯। জানা, সুবিকাশ. চোখের বালি (সম্পা.). কোলকাতাঃ শিলালিপি, ২০০৬।
১০। জানা, সুবিকাশ. চোখের বালি (সম্পা.). কোলকাতাঃ তপতি, ২০০৯।
১১। লাহা, সুজাতা. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য. কোলকাতাঃ প্রাগ্‌বিকাশ, ২০০৯।
১২। মিশ্র, গোকূলানন্দ. ঘরে বাইরে রবীন্দ্রনাথ, কোলকাতাঃ গ্রন্থ বিকাশ, ২০০৯।
১৩। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ. সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ. কোলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫।
১৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. সাহিত্য. কোলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ২০১৫।
১৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. সঞ্চয়িতা. কোলকাতাঃ শুভম, ২০১১।